Released 7-2-1947

বসুধারা বানীচিত্রের
প্রথম নিবেদন

অভিযাত্রী

কাহিনী সংলাপ

ও

প্রযোজনা

জ্যোতির্ম্ময় রায়

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য

হেমেন গুপ্ত

সংগীত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

প্রধান ভূমিকায় :

বিনতা রায়

রাধামোহন ভট্টাচার্য্য

বিশিষ্ট অংশে :

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

কমল মিত্র

শম্ভু মিত্র

বিকাশ রায়

নরেশ বসু

●

অন্যান্য অংশে

বেলারাণী, ছবি, মিসেস

এ্যাম্বার, বংশীলাল, এবং আরোও

এক হাজার একজন

বসুধারা বাণীচিত্রের প্রথম নিবেদন

কাহিনী

এক যে ছিল রাজা—এই বলে গল্প সুরু হত সেকালে। কিন্তু সে-যুগ চলে গেল, মুছে গেল রাজা আর তার রাজত্ব, তাদের নিয়ে গল্প আর চলল না। কথক তাই নূতন গল্প ফাঁদলেন; একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—তাদের পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন। শুধু এদের দুজনেরই মন দেওয়া নেওয়া, দুনিয়ার আর কোথাও যেন কিছু নেই! কিন্তু দিনের পর দিন শুধু এই গল্প শোনবার মন নিয়ে মানুষ বসে রইল না। দুনিয়া বদলে চলল অবিরাম—সেই সঙ্গে বদলালো মানুষের রুচি—সময়ের সঙ্গে যেমন করে সব বদলায়। শীতের উপভোগ্য পশমী কোট গ্রীষ্মের আরামবোধে হয়ে ওঠে অসহনীয়। তাই নিছক সেই ছেলেটি আর মেয়েটির কথা হয়ে গেল বাসি। আজ-

অভিযাত্রী

কের কথাশিল্পী গল্প বলতে বসে দেখেন নিছক প্রেমের গল্প ফাঁদতে নায়ক আর নায়িকাকে করতে হয় শুধু কল্পনার পুতুল—তাদের প্রাণ থাকে না, থাকে না চরিত্র। আজকের দিনের মানুষকে যদি গল্প শোনাতেই হয় তাহলে আজকের মানুষের দেহ-মনের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। শুধু প্রেমের গল্প—শুধু বিয়ের গল্প—আজ জমতে পারে না—এমন কি নায়ক নায়িকার মুখে স্বদেশী আনার বক্তৃতা বসিয়ে দিলেও নয়।

"অভিযাত্রীর" কথাশিল্পী আপনাদের আমন্ত্রন করেছেন প্রাণহীন পুতুলের নাচ দেখবার জন্যে নয়,—যারা মানুষ, যারা সত্যিকারের মানুষ, যুগের জীবন সংগ্রামে হৃদয়মন উৎসর্গ করেছে যারা, তাদেরই জীবন চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্যে। আজকের সমাজের সঙ্গে সব দিক জড়িয়ে যোগ

তাদের এতই নিবিড় যে তাদের গল্প বলতে গেলে একরাশি সামাজিক সমস্যাও এসে ভীড় জমায় অনিবার্য্যভাবে। অভিযাত্রীর নায়ক-নায়িকা আজকের সমাজের সহস্র গ্লানির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছে—নিছক ভাবাবেগ নিয়ে বিলাস করবার অবসর তাদের নেই।

ধরা যাক নায়িকার কথা। নাম তার জয়া। জানালার পাশে চুল এলিয়ে বসে বিরহের গান সে গায় না। আজকের দিনে সমাজ সচেতন কোন্ মেয়ের জীবনেই বা সে অবসর আছে? পথে সেদিন ধর্ম্মঘট। জয়াকে দেখতে পাওয়া গেল কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে ধর্ম্মঘটীদের দলে।

ধর্মঘট। পথ বন্ধ। কিন্তু মোটর হাঁকিয়ে বেরিয়েছিল খোদ মিলমালিক বিজয়বাবুর বড় ছেলে পরেশ। পরেশ ভেবেছিল তার অর্থের দম্ভের সামনে ধর্মঘটীর দলও মাথা নুইয়ে পথ ছেড়ে দেবে। পরেশের ঔদ্ধত্য বুঝেও বুঝতে চায় না জনসাধারণ আজ সে-মোহ কাটিয়ে উঠেছে। তাই পথের লোকদের হাতেই তাকে হতে হলো লাঞ্ছিত। আকস্মিকভাবে সেখানে এসে পড়লে জয়া—সমস্ত রাগটা পরেশের পড়ল গিয়ে জয়ারই ওপর—কেননা জয়ার বাবা মহেন্দ্রবাবু তাদেরই কর্মচারী।

খোদ বিজয়বাবু এ অবস্থায় পড়লে কী করতেন বলা কঠিন। কেন না, তিনি হলেন গত শতাব্দীর পুঁজীবাদীদের প্রতীক, অনর্থক কোলাহল করেন না, কূটনীতিকেই মানেন চরম নীতি বলে—মনে যাই থাক মুখের ভাব বিকৃত করেন না। কিন্তু আজকের দিনে পুঁজিবাদ এসে যে অবস্থায় পৌছেছে তাতে তার মুখ থেকে হঠকারিতার মুখোসটুকু পড়েছে খসে—আজ দাঁত বার করা বীভৎস আর নির্ম্মম তার

রূপ। পরেশের চরিত্র হলো তারই প্রতিচ্ছবি। জয়ার ওপর তার যে রাগ তার সমস্ত ঝাল সে মেটায় মহেন্দ্রবাবুকে অপমান করে—হোক না মহেন্দ্রবাবু তার বাবার বাল্যবন্ধু!

জয়া অন্যায় করেছে এ কথা বিশ্বাস করা মহেন্দ্র-বাবুর পক্ষে অসম্ভব! এ অপমান তিনি হজম করবেন কেমন করে? বড় ছেলে অমিয়:দেশপ্রেমের অপ-রাধে বহুদিন হলো বন্দী। ছোট ছেলে সুশান্ত দেশপ্রেমের নেশায় অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে উদাসীন! তাঁর চাকরী গেলে সংসার হয়ে পড়বে অচল। তবুও আজকের দিনে মধ্যবিত্তের যেটুকু শেষ সম্বল—আত্ম-মর্য্যাদাবোধ, সেটুকু ছাড়তে তিনি রাজি নন।

কিন্তু চাকরী তাঁকে ছাড়তে হল না। কেন না এ সময় পরেশের ভাই দেবেশ ফিরল বিলেত থেকে। দেবেশকে দেখে বিজয়বাবু হতাশ হলেন, পরেশ ভুরু কোঁচকালো—তাদের হিসেবে সে মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফেরেনি—ভুলতে পারেনি নিজের দেশ আর সেই দেশের জনগণকে! বিজয় বাবু দেখলেন তাঁর প্রথম চাল বুঝি ভেস্তে গেল; কিন্তু দ্বিতীয় চাল চালতে তিনি ভুললেন না। মহেন্দ্রবাবুকে চাকরীতে বহাল রাখা হল—তুচ্ছ কারনে এ ছেলের সঙ্গে মতবিরোধ তিনি এড়াতে চান।

জয়া কিন্তু ঘাড় পেতে এই দয়ার দান মেনে নিতে চায় না। আজকের দিনে দৈত্যকুলে যদি প্রহ্লাদ জন্মায়ও তাহলেও তার করুণা দিয়ে ভিক্ষাভাণ্ড ভর্তি করার মেয়ে আর যেই হোক জয়া নয়।

কিন্তু জয়া ভুল বুঝেছিল। ভুল ভাঙ্গল এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে। শ্রদ্ধায় জয়া মাথা নোয়ালো। তারপর, জয়ার জীবনে যেন শ্রান্তি নেই, দিনের পর দিন অবিশ্রাম সে কাজ করে চলে।

দেশের কাজ—শুধু আর্তের সেবা নয়, দেশ থেকে আর্ত বলে শ্রেণীকে তুলে দেবার পণ।

পাশেই দেবেশ। দেবেশ তাকে দেয় প্রেরণা। জয়ার কাজের নিষ্ঠা দেখে দেবেশ নিজেও হয় অনুপ্রাণিত।

পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে দুটি মন আকৃষ্ট হয় পরস্পরের প্রতি। ক্রমে সেই আকর্ষণ হয় নিবীড় থেকে নিবিড়তর।

একদিন এল আদর্শের সংঘাত; আবেগবদ্ধ দুই প্রাণের ঐক্য মাথা তুলে দাঁড়াল সত্যানুভূতির বৈষম্য। বিরুদ্ধ যুক্তি নিয়ে দেবেশকে জয়া অস্বীকার করতে চায়, কিন্তু তেমন করে পারে কই—তাকে যে সে প্রাণের গভীরে স্বীকৃতি দিয়ে বসে আছে—

এমন সময় জয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো তারই হাতে গড়া হিন্দুস্থানী যুবক আনন্দ রূঢ় কর্ত্তব্যের মুখোমুখী দাঁড়াবার আবেদন নিয়ে—

তারপর বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে কেমন করে আজকের দিনের যুবক-যুবতি মনের মিলকে আড়ালে রেখে এগিয়ে চলে—কেমন করে আবার তারা হাত মিলিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে, তারই পরিচয় দেবে "অভিযাত্রী"।

"অভিযাত্রীর" কাহিনী গড়ে উঠেছে আপনার আমার পারিবারিক আর সামাজিক সত্য এবং সমস্যাকে অবলম্বন করেই—অস্বাভাবিক অভাবনীয় ঘটনা সংস্থানে অবাক করে দেবার সস্তা কৌশল এতে নেই—আছে সত্যিকার আনন্দ দেবার মতো বাস্তবের সার্থক রূপায়ন—জাত কথাশিল্প আর চিত্রকাহিনীর যেটা প্রাণবস্তু।

ঃ গান ঃ

(এক)

ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও ॥
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক
ভাঙনের জয় গান গাও ॥
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
যাক ভেসে যাক যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ঐ মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন নূতনেরি ডাক।
ভয় করি না অজানারে
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্দাড় বেগে ধাও ॥

(দুই)

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কসে ধর হাল আমি তুলে বাঁধি পাল,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বারবার ঝনঝন্ ঝঙ্কার,
নয় এতো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার,
বন্ধন দুর্ব্বার সহ্য না হয় আর
টলমল করে আজ তাইও,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
গণি গণি দিনক্ষণ চঞ্চল করি মন
বলোনা যাই কি নাই যাইরে।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্বেগে তাকায়োনা বাইরে।

যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়োনাকো কুণ্ঠিত, তালে তাল দিয়ো তাল
জয় জয় জয় গান গাইয়ো।
হাঁইয়ো মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥

(তিন)

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো ॥
দুন্দুভিতে হোলোরে কার আঘাত গুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তি রাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো ॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি,
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো ॥

(চার)

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥
তোমার মন্ত্রবলে পাষান গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মর্মর পাতায় পাতায় ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের বাদল বাজে তোমার কী উৎসবে ?
সবুজ সুধার ধারায় ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়, বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

ঃ একমাত্র পরিবেশক ঃ

মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

৬৮, কটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

Glasgow Printing Co., Howrah.